IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ঔপনিবেশিক বাংলায় কারিগরি বিদ্যাচর্চাঃ প্রসঙ্গ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বাঙালী কারিগর

প্রণয় দে, পি এইচ ডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপঃ বর্তমান সমাজ হল যন্ত্রচালিত সভ্যতা। এই যন্ত্রের সাহায্যে সভ্যতার অগ্রসর ঘটছে। নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রয়োগ মানবসমাজের উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যাচর্চা। ভারতে তথা বাংলায় কারিগরি বিদ্যাচর্চা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনকালে। একথা উল্লেখ্যে যে প্রাক ব্রিটিশ শাসনকালেও ভারতীয় মানসমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরির প্রয়োগ ঘটেছিল। একাবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এর আস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। একথা সত্য যে ব্রিটিশরা এদেশে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সরকারীভাবে কারিগরি বিদ্যাচর্চা শুরু করেছিল। ব্রিটিশ সরকার এদেশের পথঘাট, ঘরবাড়ি, ক্যানেল প্রভৃতি নির্মাণে এবং সৈন্যবিভাগ, নৌবিভাগ ও সার্ভে বিভাগের যন্ত্রপাতি সারানো ও তৈরি, পণ্য উৎপাদন প্রভৃতি কার্যে দেশীয় কারিগর ও শিল্পীদের প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলায় গড়ে উঠেছিল একের পর এক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল ১৮৫৬ খ্রিঃ ক্যালকাটা সিভিল ইঙ্গিনিয়ারিং কলেজ। এটি ছিল ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ও পূর্ব ভারতের প্রথম কারিগরি বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র। পরবর্তীকালে নানা বিবর্তন ও নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'বেসু' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এই সিভিল ইঙ্গিনিয়ারিং কলেজটি স্বাধীন ভারত গঠনে দক্ষ কারিগর তৈরি করেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে একদিকে যেমন সরকারী উদ্যোগে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনি এই সময়কালে বেশ কিছু বাঙালী কারিগর তাঁদের বিভিন্ন যন্ত্র ও পন্য উদপাদনের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সব বাঙ্গালী কারিগরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোলকচন্দ্র, সীতানাথ ঘোষ, শিবচন্দ্র নন্দী, নীলমণি মিত্র, বিপিনবিহারী দাস, রাজকৃষ্ণ কর্মকার, হেমেন্দ্র মোহন বসু, বি এম দাস প্রমুখ।

সূচকশব্দঃ প্রযুক্তি, কারিগরিবিদ্যা, বি ই কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ্যক্রম, কারিগর।

মানবসমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যা। প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি পরিভাষা দুটি একে অপরের পরিপূরক। 'দি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ডিকশানারী অব সায়েন্সে অ্যান্ড টেকনোলোজি' তে প্রযুক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "ব্যবহারিক মূল্য বা কারিগরি শিল্প উৎপাদনে কার্যকরী মূল্য সম্পন্ন যে কোন ফলিত বিজ্ঞান বা ফলিত বিজ্ঞানসমূহের রীতি, বর্ণনা ও পরিভাষাকে একত্রে প্রযুক্তি অ্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আর প্রযুক্তির একটি ব্যবহারিক দিক হল কারিগরি। অন্যভাবে বলা যায় প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের কৌশল হল কারিগরি। মানুষ বেঁচে থাকার লক্ষ্যে ও নিজের প্রয়োজনে প্রযুক্তি ও কারিগরিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ঘটিয়ে চলেছে। বাংলা তথা ভারতের প্রযুক্তি ও কারিগরিবিদ্যার ইতিহাস অত্যন্ত সুপ্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই অস্ত্রের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কারিগরিবিদ্যার প্রকাশ ঘটেছিল। ভারতের প্রাচীন যুগ থেকেই মানব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও কারিগরি কার্যকলাপ যুক্ত ছিল।খাদ্য সংগ্রহ, নির্দয় প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর হাত থেকে রক্ষা, আগুনের ব্যবহার, গুহা, গাছের উপরে অথবা সমতল ভূমিতে ঘাস কিংবা পশুচর্মে ছাওয়া বাসস্থান তৈরি প্রভৃতি প্রাথমিক প্রয়োজনীয় কাজকর্মে কারিগরির প্রয়োগ ঘটেছিল। প্রস্তর যুগের মানুষরা নানা বস্তু উৎপাদনে প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। এই যুগের মানুষরা অস্ত্রশস্ত্র ও আগুনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি কাজে লাগিয়েছিল। প্রস্তর যুগে নির্মিত গুহাগুলিতে প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যথা ভীমবেটকা, ইদাক্কলা প্রভৃতি। পরবর্তীকালে খ্রিস্টপুর্ব ষষ্ঠ সহস্রাব্দে কৃষিকার্যের সূচনা ও প্রসারের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তি ও কারিগরির চরমভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল।[১] হরপ্পা সভ্যতায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যপক ব্যবহার দেখা যায়। এই সভ্যতার ঘরবাড়ি, নগর পরিকল্পনা, রাস্তাঘাট, স্নানাগার, জাহাজ কেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। হরপ্পা সভ্যতার জলনিকাশী ব্যবস্থা ও নর্দমা তৈরিতে সুক্ষ প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পায়। পরবর্তীকালে বৈদিক যুগ থেকে প্রাক সুলতানি পর্ব পর্যন্ত বহুল পরিমানে কারিগরি কার্যকলাপ লক্ষ্য যায়। বেদ থেকে আমরা বিশ্বকর্মা নামে এক কারিগরের নাম পাওয়া যায়।[২] কৃষিকার্যকে কেন্দ্র করে জলসেচ ব্যবস্থায় প্রযুক্তির উন্নততর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আদি মধ্যযুগেও প্রযুক্তিগত ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে মানব সভ্যতা বিশেষভাবে সচেতন ছিল। পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতকে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দারুনভাবে সাফল্য লাভ করতে থাকে। সুলতানি আমলে ভারতের বিভিন্ন সুলতানরা এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু করে ধাতুবিদ্যা, বস্ত্রবয়ন, কৃষিকার্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহন করেছিলেন এবং প্রযুক্তি ও কারিগরির বিকাশ ঘটেছিল।[৩] মুঘল আমলে ভারতের প্রযুক্তি শিক্ষা উচ্চপর্যায় লাভ করেছিল। কেননা একাধিক বিদেশি কোম্পানিগুলো ভারতে আগমন করলে সেইসব দেশের উন্নততর প্রযুক্তি শিক্ষার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল এদেশের মাটিতে। এছাড়াও কিছু মুঘল সম্রাট প্রযুক্তিগত ও কারিগরি কার্যকলাপ ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শীতল আবহাওয়ার জন্য যে প্রযুক্তির প্রয়োজন তার আবির্ভাব করেছিলেন আকবর। তাঁর অপর একটি আবিষ্কার ছিল জাহাজের উট, এটি ছিল একটি বার্জ, যার উপরে জাহাজ তৈরির পর সহজে জল পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া যেত।[৪] তাজমহল নির্মাণেও সিভিল ইঙ্গিনিয়ারিং কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। মুঘল আমলে পর্তুগীজদের আগমনের ফলে মুদ্রনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে বিবর্তন ঘটে। টিপু সুলতানের আমল থেকে শুরু করে শিবাজির যুদ্ধনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কার্যকলাপ লক্ষ্যনীয়। এইভাবে দেখা যায় ভারতের প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে মুঘল আমল পর্যন্ত সমাজের নানা দিকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও কার্যকলাপ অবস্থান করেছিল।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করতে এসে ধীরে ধীরে সমগ্র ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। উনিশ শতকে ভারতের উপর ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিকতার স্পর্শ লাগতে শুরু করেছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রেও নতুনত্ব শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকার নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি প্রযুক্তি বিদ্যার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিল। প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতে প্রযুক্তি ও কারিগরির প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেলেও প্রযুক্তিবিদ্যা লাভের কোন সরকারি ব্যবস্থা ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনকালে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ব্রিটিশরা ভারতে প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যার উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতে প্রযুক্তিগত শিক্ষা শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতে কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তার প্রধান কারণ ছিল সরকারের ভূমি পরীক্ষা করা। ১৮৪০ এর দশক থেকে ভারতে কারিগর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ শুরু হয়।[৫] ঔপনিবেশিক সরকার মানবিক ক্ষমতা তৈরির জন্য দেশীয় কারিগর গড়ে তলার উদ্দেশ্যে কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিল। কারিগর তৈরির প্রধান কারণ ছিল সার্ভে, নির্মাণকার্য ও পরিচালন কাজে ব্রিটিশদের সাহায্য করা। এছাড়াও বেশকিছু ভারতীয় কারিগর তৈরি করে ব্রিটিশ সরকারের কারিগরি বিভাগে নিম্নপদস্থ পদে কারিগর নিয়োগ করা, যাদের সংখ্যা ছিল পরিমিত।[৬] কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্বে ঔপনিবেশিক সরকার ১৮৪৪খ্রিঃ জুন মাসে বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোনে কারিগরি ক্লাস শুরু করেছিল। যদিও প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে কারিগরি ক্লাস চললেও ১৮৪৭ খ্রিঃ ৩১ শে ডিসেম্বর ছাত্রের কারণে এলফিনস্টোনে কারিগরি ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়।

ঔপনিবেশিক সরকার ভারতে তত্ত্বাবধায়ক কারিগরি পদে ব্রিটিশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেও নিম্ন কারিগরি পদগুলিতে দেশীয় কারিগর নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। বাড়িঘর, রাস্তা, ক্যানেল, বন্দর প্রভৃতি এবং সৈন্য বিভাগ, নৌ বিভাগ ও নিরীক্ষণ বিভাগের যন্ত্রপাতি নিরমানের জন্য দেশীয় কারিগর তৈরি করার উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সরকার পূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছিল এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছিল।[৭] ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকবর্গরা এদেশে কারিগরি বিদ্যা পঠনপাঠনের জন্য প্রথম দিকে প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে প্রযুক্তি ও কারিগরি কলেজ স্থাপনের আনুমোদন করেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতের প্রথম কারিগরি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, উত্তরপ্রদেশের রুরকিতে গড়ে ওঠা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ১৮৪৭ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের পরবর্তীকালে নাম হয় লেফটেন্যান্ট থমসনের নামানুসারে থমসন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রুরকি। ১৮৬৯ খ্রিঃ এর পরবর্তীকালে থমসন কলেজ কপার হিল কলেজের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিছুটা পিছিয়ে গেলেও নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং উন্নতমানের দেশীয় কারিগর তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রাচীনতম কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যা গড়ে উঠেছিল ১৮৫৬ খ্রিঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ক্যালকাটা নামে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ১৮৫৯ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, গুডনি। ১৮৬৪ খ্রিঃ বোম্বেতে গড়ে উঠেছিল পুনা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই কলেজের এক গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র ছিলেন শ্রী.এম.বিশেশ্বরা। যিনি ছিলেন ভারতের কারিগরদের পথ প্রদর্শক। ঔপনিবেশিক ভারতে তিন প্রেসিডেন্সীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি কারিগরি বিদ্যা পঠন পাঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নিলেও ব্যাঙ্গালোর, বারানসী, ধানবাদ, পাটনা, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলগুলির প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর তৈরিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিল ও সাফল্য লাভ করেছিল।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলাতে প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে নব নব আবিষ্কার বিশেষত অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন বাংলার কারিগরি শিক্ষার ইতিহাসকে দারুনভাবে আলোড়িত করেছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার পথঘাট, ঘরবাড়ি, ক্যানেল ইত্যাদি নির্মাণের জন্য দক্ষ দেশীয় কারিগর তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে বাংলাতে কারিগরি শিক্ষার পঠন- পাঠন শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাংলার প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যা চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। উনিশ শতকের ৪০ এর দশকে বাংলার কাউন্সিল অব এডুকেশন কলকাতার হিন্দু কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে পঠন- পাঠন শুরু করার সিধান্ত গ্রহণ করলেও কোন যোগ্য ব্যক্তি না থাকায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় শুরু করা সম্ভব হয়নি। ১৮৫৪ খ্রিঃ মার্চ মাসে কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি বিভাগ আলাদা ভাবে তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং ২ রা মে কোর্ট অব ডাইরেক্টস একটি আলাদা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের অনুমোদন করেছিল।[৮] সমস্ত মৌলিক বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয়ে গেলে ১৮৫৬ খ্রিঃ কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং এর ৯,১০,১১ ও ১২ নং ঘরে পথচলা শুরু করেছিল পূর্ব ভারতের প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যার নাম ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্যালকাটা। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন পেণ্ডর টপগ্রাফিক্যাল সার্ভের অধ্যাপক ই.সি.এস.উইলিয়াম, গনিতের অধ্যাপক হলেন মহেন্দ্রলাল সোম এবং সার্ভের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ডবলু.এস.শেরউইল। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্কিটেকচারের পদে কোন যোগ্য ব্যক্তি না থাকায় পরবর্তী তিন বছর পদ দুটি খালি ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে ১৮৫৭ খ্রিঃ ক্যালকাটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছিল। ঠিক একই সময়ে ছাত্র ছাত্রীদের পঠন পাঠনের সুবিধার্থে কলেজে একটি গ্রন্থাগার নির্মিত হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রিঃ দু বছরের প্রশিক্ষণ সমেত তিন বছরের থিয়রি পাঠ্যক্রমে লাইসেন্সসিয়েট ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (এল. সি. ই) এর প্রথম পরিক্ষায় ছয়জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রি লাভ করে এবং দিননোনাথ সেন প্রথম ও স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলেন এবং ১৮৬৪খ্রিঃ ব্যাচেলার ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (বি. সি. ই) পরীক্ষায় দুইজন ছাত্র সাতকড়ি চট্রপাধ্যায় ও অম্বিকাচরন চৌ ধুরী উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রী লাভ করেছিলেন।[৯] সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতের ব্যয় সংকোচনের জন্য ব্রিটিশ সরকার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উন্নয়নের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বাংলা সরকার পৃথকভাবে কলেজটি পরিচালনা করতে না চাইলে ভারত সচিবের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রেসিডেন্সী কলেজে স্থানান্তিরিত হয়েছিল।[১০] প্রেসিডেন্সী কলেজের মধ্যে অন্তর্গত এই কলেজের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। ফলস্বরুপ প্রেসিডেন্সী কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থতার কারণে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৮০ খ্রিঃ ৫ ই এপ্রিল প্রেসিডেন্সী কলেজের সিভিল ইমজিনিয়ারিং বিভাগটি হাওড়ার শিবপুরের বিশপ্স কলেজের পরিত্যাক্ত জমিতে স্থানানন্তরিত হয়ে Government Engineering College, Howrah নাম ধারন করেছিল।[১১] শিবপুর গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্র ভর্তির ও পাঠ্যক্রমের নির্দেশিকা জারি হলে ১৮৮০ খ্রিঃ ইঞ্জিনিয়ারিং এর দুটি বিভাগ- সিভিল ও মেকানিক্যাল বিভাগ নিয়ে প্রথম বর্ষ শুরু হয়েছিল। এই কলেজটিতে পূর্ববর্তী দুটি ডিগ্রী তথা এল সি ই ও বি.সি.ই এর পরিবর্তে চালু হয়েছিল লাইসেন্সসিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং (এল.ই) ও ব্যাচেলার অব ইঞ্জিনিয়ারিং (বি.ই)। এছাড়াও ছাত্রদের সুবিধার জন্য যেমন ছাত্র আবাসন তৈরি হয়েছিল তেমনি ছাত্রদের বেশকিছু বৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল। এই কলেজের

ঠিকানার সাথে 'হাওড়া' শব্দটি যুক্ত থাকার ফলে চিঠিপত্রের আদান প্রদানের সম্যসা হয়েছিল। এই কারণে ১৮৮৭ খ্রিঃ ১৮ ই মে ঔপনিবেশিক সরকার Government Engineering College, Howrah নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরন করে Civil Engineering College, Seebpore যা পরবর্তীকালে 'Seebpore' বানানটি 'Sibpur' ও পরে 'Shibpur' বানানে রূপান্তরিত হয়েছিল।[১২]

শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে উন্নত করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কলেজের ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য হাওড়ার সিভিল সার্জেন ভিজিটিং মেডিকেল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত থাকলেও কলেজে কোন হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না। এই কারণে ১৮৮৯ খ্রিঃ কলেজে প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত শুরু হয়েছিল ও ১৮৯৩ খ্রিঃ কলেজে একটি নতুন হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল। পাশাপাশি বাংলা সরকার এই কলেজে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণি যুক্ত কৃষি বিভাগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যার ফলস্বরুপ ১৮৯৮ খ্রিঃ ১২ ই জুন শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কৃষিবিদ্যা বিভাগ ও এর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন নিত্যগোপাল মুখার্জী।[১৩] এছাড়াও এই কলেজের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল 'শিবপুর কলেজ পত্রিকা' নামে একটি দেশীয় ভাষায় মাসিক পত্রিকার প্রকাশ। একদিকে যেমন রেল ইঞ্জিন, বড় পাম্পিং প্রভৃতি তৈরির জন্য শুরু হয়েছিল আর্টিজেনের ক্লাস, অন্যদিকে তেমনি খনি ম্যানেজার ও সহকারি ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু হয়েছিল। ১৯০৫-০৬ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরীক্ষা পরিবর্তিত হয়েছিল। Licence in Engineering (L.E) বাতিল হয়ে যায় এবং শুরু হয় Intermediate Examination in Engineering (I.E)। আবার Master of Engineering এর বিকল্প হিসাবে Doctor in Engineering ডিগ্রী শুরু হয়েছিল।[১৪] এইভাবে কলেজটি যখন নিরাপদভাবে শিবপুরে বিকাশ লাভ করেছিল তখন ওখানকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে কলেজের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ছাত্রদের বিশেষত শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের কথা ভেবে শিবপুরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কলেজের স্থানান্তরের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ হিসাবে রাঞ্চি,হাজারিবাগ, ডেহরি, মাধবপুর ও খড়গপুরের নাম উল্লেখিত হলেও শেষপর্যন্ত উপযুক্ত স্থান হিসাবে রাঁচি গৃহীত হয়েছিল। নানা অসুবিধার কারণে কলেজ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া বাতিল হয়েছিল এবং শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পঠন পাঠন নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছিল। এই অবস্থাতেই কলেজে নতুন নতুন বিভাগ তথা মোটর মেকানিক্যাল, টেলিগ্রাফ প্রশিক্ষণ প্রভৃতি শুরু হয়েছিল। ১৯২০ খ্রিঃ সরকার এক নির্দেশ জারি করে এই কলেজটির নাম পরিবর্তিত করে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর এবং ১৯২১ খ্রিঃ আর একটি নির্দেশ জারি করে আগের নামের শেষের আংশ 'শিবপুর' শব্দটি বাদ দিয়ে নতুন নামকরন হয়েছিল Bengal Engineering College।[১৫] এই কলেজটি বি ই কলেজ নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বি ই কলেজ আধুনিক ভারতের ডিজাইনার, বিলডার্স ও আর্কিয়েক্টস উৎপাদনের এক অন্যতম ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছিল। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিভিন্ন বিভাগগুলির সংস্কার ও উন্নতির জন্য স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির নেতৃত্বে ১৯২১ খ্রিঃ মুখার্জী কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটির পরামর্শ অনুসারে কাঁচারাপাড়াতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একটি শ্রেণি স্থানান্তরিত হয়েছিল ও একটি টেকনিক্যাল স্কুল গড়ে উঠেছিল। ঠিক হয়েছিল যে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ পাওয়ার আগে কাঁচড়াপাড়াতে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। ভারতের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ –ই প্রথম প্রতিষ্ঠান যেখানে সরকারের উচ্চ পদগুলিতে অধিষ্ঠিত আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। ১৯২৫-২৬ খ্রিঃ এই কলেজে তিনটি নতুন পদের সৃস্টি হয়েছিল, যথা- প্রফেসর অব ফিজিক্স, ফোরম্যান ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডেমোন্সট্রটর ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এছাড়াও দক্ষ ভারতীয় কারিগর তৈরি করার জন্য মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা এবং মেকানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কোর্স শুরু হয়েছিল। পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, পুনা ও মহীশূরের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারে ডিগ্রী পাঠ্যক্রম চালু হলে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়েছিল। এই কারণে ১৯৩০ খ্রিঃ সরকার কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রী কোর্স চালু করার নির্দেশ দিয়েছিল। এই কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩২ খ্রিঃ। পরবর্তীকালে অর্থের অভাবে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে তিনটি ভিজিটিং লেকচারের পদ সহ মোট সাতটি পদের অবসান ঘটানো হয়েছিল।[১৬] এর পাশাপাশি আবার পাঁচটি ভিজিটিং লেকচারের পদ নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। এর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সামরিক বাহিনী, অস্ত্র নির্মাণ ও বিমান বাহিনীর জন্য প্রচুর সংখ্যক কারিগর তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকার এই কলেজে ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে কারিগর তৈরির জন্য ১৯৪০-৪১ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রদের প্রথম বর্ষের ভর্তি বাতিল করে সরকারের নির্দেশে কলেজে দুটি প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম শুরু হয়েছিল, যথা- এয়ারফোর্স মেকানিকস ট্রেনিং স্কিম ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কিম। পরবর্তীকালে ১৯৪৩ খ্রিঃ বাংলার কারিগরি ও শিল্পবিদ্যা পরিদর্শন এবং উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা অনুশীলনের জন্য মি এফ রহমানের সভাপতিত্বে এক কমিটি গড়ে উঠেছিল। এই কমিটি কলেজের ওয়ার্কশপ ও ল্যাবরেটরির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছিল। কমিটি উল্লেখ করেছিল যে কলেজে ইতিমধ্যে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেটালজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু রয়েছে, তাই জাহাজ তৈরি, বিমান চালনা বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিল। ১৯৪৫ খ্রিঃ কলেজের কারিগরি বিদ্যা ও প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য ভারত সরকার পূর্ত বিভাগের ডাইরেক্টরের অধীনে একটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি নিয়োগ করেছিল। ১৯৪৫ খ্রিঃ ১৯ শে মে এই কমিটি তাদের প্রতিবেদনকে 'ইমিডিয়েট প্ল্যান' ও 'ফাইভ ইয়ার প্ল্যান'- এই দুই ভাগে বিভক্ত করে সরকারের কাছে জমা দিয়েছিল।[১৭] এই কমিটি উল্লেখ করেছিল যে ইমিডিয়েট প্ল্যান গ্রহনের মধ্য দিয়ে উচ্চ কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে ও একাধিক কারিগর তৈরি করা যাবে। কমিটি ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও উল্লেখযোগ্য ডিগ্রী কোর্স চালু করার পরামর্শ দিয়েছিল। এরই ফলস্বরুপ ১৯৪৬ খ্রিঃ কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম রীতি পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল ইংরেজি, সাধারন নলেজ, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিত্রকলা এবং সর্বশেষ সাক্ষাৎকার। ১৯৪৭-৪৮ খ্রিঃ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইতিহাসে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার জন্য দুজন ছাত্রী কলেজে ভর্তি হয়েছিল এবং প্রথম বাঙ্গালী মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে ইলা মজুমদার কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন। ইতিমধ্যে ইমিডিয়েট প্ল্যান

সম্পুর্নভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নতুন নতুন পদের সৃষ্টি হয়েছিল। অপরদিকে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল উন্নত পাঠ্যক্রম, ভালো শিক্ষক, উন্নত ক্রমবিন্যাস যুক্ত ডিগ্রী কোর্স, শিল্পের সাথে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়ন, গবেষণার ব্যবস্থা প্রভৃতি। ইমিডিয়েট প্ল্যান বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রয়োগ করার সময়কালে ১৯৪৭ খ্রিঃ ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে নতুন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে যখন দেশবাসী স্বপ্নে বিভোর, সেই সময় দেশ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ কারিগর তৈরির গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই কলেজটি ১৯৯২ খ্রিঃ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিনে থাকে এবং পরবর্তীকালে ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে বর্তমানে 'ভারতীয় প্রকৌশল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান' নামে আস্তিত্ব বজায় রেখেছে। তাই বলা যায় ঔপনিবেশিক ও ওউপনিবেশিকত্তোর বাংলা তথা ভারতের কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল ক্যালকাটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

ব্রিটিশ সরকার নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য কারিগরি বিদ্যাচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছিল। এর পাশাপাশি বিশ শতকের প্রথমদিকেই বাংলায় শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের একটি অন্যতম ধারা ছিল জাতীয় শিক্ষা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় স্বদেশী উদ্যোগে প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যাচর্চার বিকাশ ঘটেছিল। ১৯০২ খ্রিঃ সতীশচন্দ্র মুখার্জির নেতৃত্বে কলকাতার মেট্রোপলিটন কলেজের ভেতরে ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ডন সোসাইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল শিল্প শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মশালার পরিচালনা। অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দিতেন। ডন সোসাইটি বাংলার কারিগর তৈরীর যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। ফিটার মিস্ত্রী, ঢালাই মিস্ত্রী, রসায়নবিদ, বস্ত্রশিল্পী প্রমুখ প্রচুর পরিমাণে বাংলায় কারিগর তৈরী করেছিল ডন সোসাইটি। বেঙ্গল ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন বাংলায় প্রযুক্তিশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল বেঙ্গল টেকনিক্যাল এডুকেশন বা বি.টি.আই। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট ২৫ শে জুলাই ১৯০৬ খ্রিঃ, ৯২ আপার সার্কুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার প্রথম অধ্যক্ষ প্রমথবসু ও রাসবিহারী ঘোষ। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটকে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমরূপ প্রদান করার জন্য ১৯২৮ খ্রিঃ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে করা হয় কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলোজি বা সি.আই.টি। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ খ্রিঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যখন গড়ে ওঠে তখন থেকেই কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলোজি ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।[৫] যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়য়ের সাথে যুক্ত কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলোজি এর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি ছিল ইলেকট্রিক্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড টেকনোলোজি, ইন্সট্রুমেনশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি যেগুলি দক্ষ কারিগর তৈরি করে দেশে ও বিদেশে সুনাম ছড়িয়ে চলেছে।[১৮]

একথা উল্লেখ্য যে ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলায় একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশী উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কারিগরি বিদ্যাচর্চায় গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছিল। এর পাশাপাশি বেশকিছু বাঙ্গালী কারিগর বাংলায় কারিগরি বিদ্যাচর্চায় তাৎপর্যপুর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রী গোলকচন্দ্র, যিনি ছিলেন বাংলার একজন দক্ষ কারিগর। ভারতে প্রথম

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আগমন ঘটে ১৮২০ খ্রিঃ। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কার্যকারিতাকে ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোন বিদেশী সাহায্য ছাড়াই অনুরূপ একটি ইঞ্জিন নির্মাণ করেছিলেন টিটাগরের গোলকচন্দ্র। গোলকচন্দ্র নির্মিত ইঞ্জিনটিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য উইলিয়াম কেরির পরামর্শ অনুসারে ১৮২৮ খ্রিঃ ১৬ ই জানুয়ারি এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনিতে প্রদর্শিত করা হয়। প্রদর্শনিতে গোলকচন্দ্র তাঁর আবিষ্কৃত ইঞ্জিনটির সাহায্যে পাম্প চালান ও জল তুলে সকল জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জর্জ স্মিথ লেখেন In the society's proceedings for the January 1828, we find this significant record: Resolved at the suggestion of the Rev. Dr. Carey that permission be given to Golak Chandra , a blacksmith of Titagar, to exhibit a steam engine made by himself without the aid of any European artist. At the next meeting, when 109 malees or native gardeners completed at the annual exhibition of vegetables, the steam engine was sumitted and pronounced useful for irrigating lands made upon the model of a large steam engine belonging to the missionaries at Serampore; a premium of RS. 50 was presented to the ingenious blacksmith as an encouragement to the further exerations of his Indastry.[১৯] গোলকচন্দ্র ছিলেন ভারতের ইঞ্জিন নির্মাতা। ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার টিটাগরের শ্রী গোলকচন্দ্র ছিলেন বাংলা তথা ভারতের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার।

বাংলার কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে একজন উল্লেখযোগ্য কারিগর ছিলেন সীতানাথ ঘোষ। সীতানাথ ঘোষ একটি তুলাকল ও একটি তাঁত উদ্ভাবন করেছিলেন যেটি গাড়ি টানা জন্তু বা বাষ্প বা কায়িক শ্রমের দ্বারা চালানো হত। সীতানাথ ঘোষ হিন্দুমেলার পঞ্চম অধিবেশনে ১৮৭১ খ্রিঃ তাঁর নব নির্মিত তুলাকলটি প্রদর্শন করেন। ন্যাশানাল সোসাইটির মঞ্চে এয়ারপাম্প ও যান্ত্রিক তাঁত প্রদর্শন করার পাশাপাশি সীতানাথ ঘোষ বিদ্যুৎ বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন ১৮৭১ খ্রিঃ গ্রীষ্মে কতিপয় বন্ধুবর্গের অনুরোধে ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির হলে ন্যাশানাল সোসাইটির মিটিং- এ প্রক্রিয়াগুলির বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক বিষয়টির উপর পর পর দুটি বক্তৃতা দেন।[২০] সীতানাথ ঘোষের সবথেকে গুরুত্বপুর্ণ প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ছিল চুম্বকীয় নিরাময় যন্ত্র, ম্যাগনেটিক হিটার, গমভাঙ্গার কল, যন্ত্রচালিত লাঙ্গল (বলদ ও একটি যান্ত্রিক নৌকার চালিত), মুদ্রণ যন্ত্রের কালি প্রভৃতি। হিন্দুমেলা ও ন্যাশানাল সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশন সীতানাথ ঘোষ বাংলার প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রচুর বক্তৃতা উপস্থাপিত করেছিলেন। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সীতানাথ ঘোষের বিভিন্ন বক্তব্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারনায় উল্লেখিত হয়েছে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জোড়াসাঁকোর বাসভবনে প্রতি রবিবার প্রথমিক বিজ্ঞান শিক্ষাকালে সীতানাথ ঘোষের বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো তাঁকে খুবই আনন্দিত করত।[২১]

বিপিনবিহারী দাস সর্বপ্রথম বাঙ্গালী হিসাবে একটি সম্পুর্ণ গাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পুরোপুরি স্বদেশী উপকরণের দ্বারা মোটরগাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম ছিল স্বদেশী। বিপিনবিহারী দাস নির্মিত স্বদেশী নামক মোটরগাড়িটি ১৯৩৩ খ্রিঃ সর্বপ্রথম কলকাতার রাস্তায় চলতে শুরু করেছিল। এই গাড়িটির গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৩৫ মাইল।[২২] দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ ও ব্যান্ডেল রোডের মোডের কাছে বিপিনবিহারী দাসের মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানা ছিল। গাড়ির টায়ার, বডি ও চেসিস সবকিছুই বিপিনবিহারী দাস তাঁর কারখানায় নিজ হস্তে তৈরি করতেন। তাঁর নির্মিত গাড়িটিতে পাঁচ জনের বসবার আসন ও চারটি দরজা

ছিল। ১৯৩১ খ্রিঃ বিপিনবিহারী দাস তাঁর নির্মিত গাড়িটিকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়য়ের কাছে বিক্রি করেন এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু গাড়িটি ব্যবহার করতে থাকে। তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যের জন্য অপর একটি মোটরগাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক বাংলায় বিপিনবিহারী দাস সর্বপ্রথম মোটরগাড়ি নির্মাণ করে উন্নত ও দক্ষ কারিগর হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।[২৩]

ঔপনিবেশিক ভারতে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ লাইন পাতার ক্ষেত্রে শিবচন্দ্র নন্দী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি কারিগরি দক্ষতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন সেই সময়কালের কলকাতার টাঁকশালের রাসায়নিক পরীক্ষক ও শনেসির প্রতি। সর্বপ্রথম ১৮৩৯ খ্রিঃ সাফল্যের সাথে পরিক্ষামূলকভাবে কলকাতার সন্নিকটে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে টেলিগ্রাফ লাইন শুরু হয়। সনেশি বাঁশের খুঁটির সাহায্যে টেলিগ্রাফের তার পাতেন এবং দুই প্রান্তের মধ্যে বার্তা পরিবহনে সফল হন। ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ লাইন ব্যবস্থায় শিবচন্দ্র নন্দীর উল্লেখযোগ্য অবদান হল একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তার টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় তালগাছের খুঁটির ব্যবহার করেন। তার টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সূক্ষ্ম প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। আধুনিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থায় খুঁটির মাথার তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় এবং সেই বিদ্যুৎ যাতে সমস্ত গাছের মধ্যে সম্পৃক্ত না হয় তার জন্য শিবচন্দ্র নন্দী বিজ্ঞানসম্মতভাবে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ শুরু করার জন্য আলাপ আলোচনা হলে ঔপনিবেশিক সরকার শিবচন্দ্র নন্দীর পরিকল্পনাকে অনুমোদন করেছিল। কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার এবং কলকাতা থেকে খেজুরি পর্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন টানার কাজ আগাগোড়া তদারকি করেন শিবচন্দ্র নন্দী। ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বিষয়ে উন্নয়ন ও বিস্তার লাভে শিবচন্দ্র নন্দীর অবদান ছিল অসামান্য। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল।[২৪]

ভারতের কারিগরি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন রাজকৃষ্ণ কর্মকার। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তাঁর কারিগরি বুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গোলা বারুদ উদপাদনে সামরিক বিষয়ে তিনি প্রযুক্তিগত দিক থেকে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি নেপালে টাঁকশালের কাজ করাকালীন সামরিক বিভাগের উন্নতির জন্য একটি জলচক্র স্থাপন করেন এবং কাবুলে নতুন যন্ত্রের দ্বারা গোলা বারুদের কারখানা তৈরি করেন। রাজকৃষ্ণ কর্মকার মেশিনগান তৈরি করতেও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলে রাজকৃষ্ণ কর্মকার একের পর এক যন্ত্র আবিষ্কার করে কারিগর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৮৮৫ খ্রিঃ কলকাতায় সর্বপ্রথম ইলেকট্রিক্যাল আলোর ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তীকালে ১৮৮৯ খ্রিঃ ব্রিটিশ কোম্পানি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই কোম্পানি শুরু করেছিল জেনারেটারের ইলেকট্রিক্যাল। দেখা যায় যে ব্রিটিশ কোম্পানির আগেও কলকাতার একটি বিবাহের শোভাযাত্রায় এক নতুন ধরনের ইলেকট্রিক আলোর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চিতপুর রোড দিয়ে শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় ১৫০০ বাতির উজ্জ্বল্যের আলোর যেমন দীপ্তি তেমনি চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই ধরনের দীপ্তি ও উজ্জ্বল্যযুক্ত আলোটি যে ইলেকট্রিক কারিগর তৈরি করেন, তিনি ছিলেন শীল অ্যান্ড কোম্পানির একজন উদীয়মান তরুণ কারিগর, যার নাম হল কালীদাস শীল। ইলেকট্রিক আলো ছাড়াও কালীদাস শীল মোটর, সেলাই মেশিন ও টেবিলফ্যানের ক্ষেত্রে এক উন্নতধরনের প্রযুক্তির প্রয়োগ করেছিলেন।[২৫]

ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ কারিগর ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জামাতা হেমেন্দ্রমোহন বসু। হেমেন্দ্রমোহন বসুর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল ম্যানুফাকচারিং পারফিউমার হিসাবে। কুন্তলীন কেশতৈল এর আবিষ্কর্তা হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর পিসেমশায়ের বাড়ির বর্ণনায় বলেছিলেন যে, সে বাড়ির তিনতলায় লম্বা একটি ঘরে পিসেমশাই হেনেন্দ্রমোহন বসু তাঁর ল্যাবরেটরি করেছিলেন, সেখানে বসে তিনি নানারকম সুগন্ধি তৈরির পরীক্ষা করতেন। ঘরটার দিকে গেলেই সুগন্ধ ভুরভুর করত। কত রকমারি শিসি, বোতল, রাশি রাশি ফুল, চোলাই করবার যন্ত্র, বড় পাথরের নল ও হামানদিস্তা, এক কোণে একটি সোডা তৈরির কল, সেরকম আমরা আগে কখনও দেখিনি। হাতল টিপলেই ভুসভুস করে নল দিয়ে সোডা ওয়াটার বেরোত, সিরাপ মিশিয়ে আমাদের খেতে দিতেন।[২৬] কারিগরি দক্ষতার ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রমোহন বসু উজ্জ্বল কৃতিত্বের পরিচয় দেন রেকর্ড ব্যবসায়। তিনি ফেনোগ্রাফের রেকর্ড তৈরি করেন এবং এটি তৈরির ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রমোহন বসু ছিলেন একজন যন্ত্র রসিক মানুষ। তাই তাঁর মধ্যে কারিগরি জ্ঞান বর্তমান থাকা ছিল স্বাভাবিক।

কলকাতার আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পিছনের সরু গলিটি যার নামকরণে তিনি ছিলেন বাংলার বিখ্যাত কারিগর নীলমণি মিত্র। ১৮২৮ খ্রিঃ ১ লা জানুয়ারি কলকাতার মিত্র পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী নীলমণি মিত্র দারিদ্র্যের কারণে ডায়মন্ড হারবারের বড়দা গ্রামে মামার বাড়িতে লালিত পালিত হয়েছিলেন। নীলমণি মিত্র ছিলেন প্রথম সরকারি ডিগ্রিধারী বাঙালী কারিগর। তিনি রুরকি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রথম বাঙালী ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন করেন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত স্থপতি ছিলেন, যিনি উনিশ শতকের কলকাতার বিখ্যাত ভবনগুলি নির্মাণের পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করেছিলেন। তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন গঙ্গা নদীর প্রকল্পের গাঙ্গেয় ক্যানেল প্রকল্প বিভাগে। এর পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সী বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নিযুক্ত হন। স্থপতি হিসাবে বাংলার প্রথম বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র কলকাতার বেশকিছু শ্রেষ্ঠ কাঠামোর নকশা করেছিলেন। এইগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউটের ভবন দুটিই তিনি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছিলেন। এছাড়াও স্থাপত্যবিদ হিসাবে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর আছে মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স ভবনের নকশা নির্মাণ, সাদা মার্বেলের প্রাসাদবহুল কাঠামো যুক্ত মোহনবাগান ভিলা, নন্দলাল বসুর প্রাসাদ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ প্রভৃতি। বর্তমান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারল্ড বোওয়ার নকশা ছিল নীলমণি মিত্রের পরিকল্পনাপ্রসূত। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কাজ ছিল বাগবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত বসু বাটি বা বসুদের বাড়ি। এটি নির্মাণে তিনি প্রচলিত ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীকে বাদ দিয়ে ঐতিহ্যবাহী বাঙালী স্থাপত্য ও ইসলামীয় স্থাপত্যের সংমিশ্রণে রচনা করেছিলেন। এছাড়াও মহেশের বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের রথের নকশা এবং তৎকালীন বিহারের মধুপুরে বাঙালী বসতি স্থাপনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[২৭] প্রথম বাঙালী ডিগ্রী প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নীলমণি মিত্র ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৮৯৪ খ্রিঃ ২ রা আগস্ট নীলমণি মিত্রের মৃত্যুর পরের বছর ১৮৯৫ খ্রিঃ ২৬ শে জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে ভাইস চ্যান্সেলার অ্যালফ্রেড ক্রুফট তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন To the residents of Caicutta, it may be said si monumentum requires circumspice (if you seek his monument look around you). The mansions of many of the wealthy inhabitants of Calcutta and other important buildings of public character, bear witnes to the originality and success of his ideas.[২৮]

ক্যালকাটা রিসার্চ ট্যানারি এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন চামড়া বিজ্ঞানের জনক বি.এম.দাস। বাংলায় দেশীয় পশুর ছাল ও চামড়া ব্যবহার করে চামড়া শিল্পের উন্নতির পথ প্রশস্থ করেছিলেন। ক্যালকাটা ট্যানিং ইন্সটিটিউটে বি এম দাস দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা প্রদান করে ট্যানিং এ বিশেষজ্ঞ তৈরি করেছিলেন। তিনি ছাত্রদের সুবিধার জন্য ট্যানিং বিষয়ে একটি বই লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ গোয়েন্দা উদ্দেশ্য কমিটির সাথে চামড়া প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়াও এই পর্বে যেসব বাঙালী কারিগররা ছিলেন, তাঁরা হলেন রসিকলাল দত্ত, প্রমথনাথ বসু, সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি প্রমুখ। এইসব বাঙালী কারিগরদের হাত ধরে একদিকে যেমন বাংলার কারিগরি বিদ্যাচর্চায় ঔপনিবেশিক মোহ দূর হতে থাকে, তেমনি এই কারিগরদের উৎপাদিত স্বদেশী যন্ত্র বাংলার কারিগরি বিদ্যাচর্চাকে উন্নত পর্যায়ে উপনীত করেছিল।

তথ্যসূত্র

১। সিদ্ধার্থ রায়, প্রাথমিক প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯২ খ্রিঃ, পৃঃ ৯।

২। Ajoy Kumar Ray, Engineering Science, Vol.vii, kolkata, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 2014, p. preface।

৩। উত্তরা চক্রবর্তী, ‘সুলতানি আমলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি’, ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স. অপরাজিত বসু, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১৯৯৭ খ্রিঃ, পৃঃ ৯১-৯২।

৪। Irfan Habib, ‘Akbar and Technology’, ed. Irfan Habib, Akbar and his India, New Delhi, Oxford University Press, 1997, Pp 129-148.

৫। সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত রাজবংশী, ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০২২, পৃঃ ৮০।

৬। দীপক কুমার, ব্রিটিশ ভারতে বিজ্ঞান, প্রথম সংশোধিত বাংলা সংস্করণ, কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০২৩, পৃঃ ২৪১।

৭। Roy Macleod, Deepak Kumar, ed, Technology and the Raj, Second Edition, Delhi, Aakar Books, 2022, Pp. 216-18.

৮। Madan Bhattacharyya (Ed.), Centenary Souvenir, Howrah, Bengal Engineering College, 1956, p.7.

৯। Dipak Sengupta and Indra N Sinha (Ed.), Inaugural Souvenir, Shibpur, Indian Institute of Engineering Science and Technology, 2014, p.7, 9.

১০। West Bengal State Archive, General Education Department, No, 6-8, Kolkata, 1864.

১১। West Bengal State Archive, General Education Department, No, 10-11, Kolkata, 1880.

১২। বিভোর দাস, শিবপুর বি ই কলেজ; কারিগরি শিক্ষার ঐতিহ্য- এর উত্তরাধিকার, শিক্ষা দর্পণ, উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যালয় দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক চতুর্মাসিক পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ/প্রথম সংখ্যা, ২০১৬, পৃ.১০৭।

১৩। West Bengal State Archive, General Education Department, No, B10-13, Kolkata, 1898.

১৪। Ajoy Kumar Ray, Engineering Science, op.cit, p. 148.

১৫। Madan Bhattacharyya (Ed.), Centenary Souvenir, op.cit, p. 35.

১৬। West Bengal State Archive, General Education Department, No, B229-31, Kolkata, 1943.

১৭। Dipak Sengupta and Indra N Sinha (Ed.), Inaugural Souvenir, op.cit, p. 28-29.

১৮। Samir Kumar Saha, Engineering Education in India Past, Present & Future, First Published, Kolkata, Sahitya Samsad, 2012, p.72-74.

১৯। অরূপরতন ভট্টাচার্য, বাঙালির বিজ্ঞানভাবনা ও সাধনা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৬৬-১৬৭।

২০। সিদ্ধার্থ ঘোষ, কলের শহর কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ ৫১।

২১। চিত্তব্রত পালিত, বিজ্ঞানের আলোকে ঔপনিবেশিক বাংলা, সমাজ বিজ্ঞান গ্রন্থমালা, স, দিব্যেন্দু হোতা, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, পৃ.৫১।

২২। Ajoy Kumar Ray, Engineering Science, op.cit, p. 130-131.

২৩। অরূপরতন ভট্টাচার্য, বাঙালির বিজ্ঞানভাবনা ও সাধনা, প্রাগুক্ত, পৃ ২০২।

২৪। সিদ্ধার্থ ঘোষ, কলের শহর কলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০-১১৩।

২৫। অরূপরতন ভট্টাচার্য, বাঙালির বিজ্ঞানভাবনা ও সাধনা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮০।

২৬। অরূপরতন ভট্টাচার্য, বাঙালির বিজ্ঞানভাবনা ও সাধনা, তদেব, পৃ ১৮৯।

২৭। Trinanjan Chakraborty, Nilmani Mitra: The first qualified Bengali engineer who dared to dream, The Telegraph India, Kolkata, 13.07.23.

২৮। সিদ্ধার্থ ঘোষ, কলের শহর কলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৩।